খুশবন্ত সিং

ট্রেন টু পাকিস্তান

অনুবাদ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

ভূমিকা

১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকাল। ভারতবর্ষকে ব্রিটিশরা ভাগ করে দিয়েছে হিন্দু ভারত ও মুসলিম পাকিস্তানে। প্রায় এক কোটি মানুষ সদ্য চিহ্নিত সীমান্ত অতিক্রম করে তাদের নতুন গন্তব্য, নতুন দেশ বেছে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাতে জড়িত হলো। নিহতের সংখ্যা দশ লাখে পৌঁছল। সেই শঙ্কাপূর্ণ দিনগুলোতেও সীমান্তের নিকটবর্তী কিছু কিছু গ্রাম ছিল শান্তির নীড়। কিন্তু সীমান্তের উভয় পারে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা যখন বাড়তে থাকে পাকিস্তান ও ভারত অভিমুখী শরণার্থীর ঢলও বেড়ে চলে। দাঙ্গার মর্মস্পর্শী কাহিনি, নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতেও অজানা বিপদের ছায়া বিস্তার করে। পাঞ্জাব সীমান্তের ছোট শিখ প্রধান গ্রাম মানো মাজরাতেও দেশবিভাগের ঘটনার পর থেকে বিরাজ করছিল অস্বস্তিকর শান্তি। কারণ এ গ্রামে বেশ কিছু শান্তিপ্রিয় মুসলমানের বাস ছিল। যুগযুগ ধরে শিখদের সাথে তারা ভাই এর মতোই কাটিয়ে এসেছে। একদিন মানো মাজরা রেলওয়ে স্টেশনে পাকিস্তান থেকে এসে থামল এক ভূতুড়ে ট্রেন। নীরবে আগত ট্রেনটিতে ছিল ভারতের উদ্দেশ্যে আসা সহস্রাধিক শরণার্থীর লাশ। এ ঘটনা গ্রামবাসীদের মাঝে প্রথমবারের মতো দুঃস্বপ্ন বয়ে এনেছিল—হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও লুটপাট। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহসা ঘৃণা, সন্দেহ ও বিদ্বেষের জন্ম হলো। ভারত বিভাগের পটভূমিতে লেখা খুশবন্ত সিং-এর উপন্যাস 'ট্রেন টু পাকিস্তান'-এ নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সমসাময়িক পরিস্থিতিতে দুই সম্প্রদায়ের লোকদের মানসিক অবস্থা। উপন্যাসটি গ্রোভ প্রেস পুরস্কার লাভ করে দেশবিভাগের ওপর শক্তিশালী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিবরণীর স্বীকৃতি হিসেবে। শুধু সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বই 'ট্রেন টু পাকিস্তান'-এর মূল উপজীব্য নয়, শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান শত শত বছরের পুরোনো ধর্মীয় ঘৃণা বিদ্বেষের মাঝে সেতুবন্ধন সৃষ্টির প্রয়াস হিসেবে শিখ যুবকের সঙ্গে মুসলিম বালিকার প্রেমের ঘটনাও প্রাধান্য পেয়েছে উপন্যাসে।

সূ চি প ত্র

ডাকাতি ১১
কলিযুগ ৮৬
মানো মাজরা ১২৭
কর্ম ১৪৯

ডাকাতি

উনিশশ সাতচল্লিশের গ্রীষ্মকালটা ভারতের অন্যান্য গ্রীষ্মের মতো ছিল না। এমনকি ওই বছরের আবহাওয়াও ভারতে ভিন্নরকম মনে হয়েছে। বরাবরের চেয়েও উত্তপ্ত, শুষ্ক এবং ধূলিময়। গ্রীষ্ম মৌসুমও যেন দীর্ঘতর। কেউ স্মরণ করতে পারে না যে কবে বর্ষার আগমন এত বিলম্বিত হয়েছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে বিক্ষিপ্ত মেঘ শুধু ছায়া বিস্তার করে। কোনো বর্ষণ নেই। লোকজন বলাবলি করছে, ঈশ্বর তাদের কৃত পাপের শাস্তি দিচ্ছেন।

তাদের অনেকেরই মনে করার সংগত কারণ ছিল যে, তারা পাপ করেছে। গ্রীষ্মের আগে দেশটিকে হিন্দু ভারত ও মুসলিম পাকিস্তানে বিভাজনের প্রস্তাব করা হয়েছে মর্মে খবর ছড়িয়ে পড়ায় কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। কয়েক মাসের মধ্যে নিহতের সংখ্যা কয়েক হাজারে ওঠে। মুসলমানরা অভিযোগ তোলে যে, হিন্দুরা দাঙ্গার পরিকল্পনা করে হত্যাকাণ্ড শুরু করেছে। হিন্দুদের মতে, মুসলমানরাই দাঙ্গার জন্য দায়ী। আসল ঘটনা হলো, দুপক্ষই হত্যা করেছে। উভয় পক্ষই গুলি করেছে, ছুরি মেরেছে, বর্শায় বিদ্ধ করেছে এবং লাঠির ব্যবহার করেছে। দুপক্ষই নির্যাতন করেছে, ধর্ষণ করেছে। কলকাতা থেকে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ও পূর্বদিকে এবং পশ্চিমে : পূর্ববঙ্গের নোয়াখালীতে। সেখানে মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। বিহারে হিন্দুরা মুসলমানদের হত্যা করে। মোল্লারা মানুষের খুলিভরতি বাক্স নিয়ে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে প্রদর্শন করে যে, এগুলো বিহারে নিহত মুসলমানদের। কয়েকশ বছর ধরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বসবাসকারী হাজার হাজার হিন্দু ও শিখ তাদের বাড়িঘর ত্যাগ করে পূর্বদিকে শিখ ও হিন্দু প্রধান এলাকায় পালিয়ে যায় নিরাপত্তার আশায়। তারা পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে, লরিতে গাদাগাদি করে, ট্রেনের পাশে ঝুলে ও

ছাদে উঠে পথ পাড়ি দিয়েছে। পথিমধ্যে— খাল, নদীর তীরে, রাস্তার সংযোগস্থলে, রেলস্টেশনে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় পশ্চিম দিকে পলায়নরত সন্ত্রস্ত মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এক একটি দাঙ্গার পরিণতি হতো চরম বিশৃঙ্খলা। ১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মে যখন নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হলো, এক কোটি মানুষ— মুসলিম, হিন্দু ও শিখরা লিপ্ত হলো যুদ্ধে। বর্ষা মৌসুম শুরুর আগেই তাদের প্রায় দশ লাখ লোক মারা গেল। উত্তর ভারতের সকলের হাতে তখন অস্ত্র। তারা আতঙ্কগ্রস্ত অথবা পালিয়ে ছিল। সীমান্তের প্রত্যন্ত এলাকায় শান্তির মরূদ্যানের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল শুধু ছোট ছোট গ্রামগুলো। মানো মাজরা সেই গ্রামগুলোর একটি।

মানো মাজরা ছোট এক এলাকা। তিনটি মাত্র ইটের দালান এ গ্রামে। এর মধ্যে একটি সুদখোর লালা রাম লালের। অপর দুটি শিখ মন্দির ও মসজিদ। মাঝখানে একটি বিশাল বটবৃক্ষকে অভিন্ন অবস্থানে রেখে দালানগুলো একটি ত্রিভুজ গঠন করেছে। অবশিষ্ট গ্রাম মাটির তৈরি চালাঘরের গুচ্ছ, অনুচ্চ দেওয়াল বেষ্টিত আঙিনা। বাড়ির মাঝখান থেকে সরু গলি সামনে বের হয়ে পায়ে চলা পথে পড়েছে এবং সে পথ হারিয়ে গেছে আশপাশের ফসলের মাঠে। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কীকর গাছ বেষ্টিত একটি পুকুর। মানো মাজরায় সত্তরটি পরিবারের বাস এবং লালা রাম লালের পরিবারই গ্রামের একমাত্র হিন্দু পরিবার। অন্য পরিবারগুলো শিখ বা মুসলমান, সংখ্যায় প্রায় সমান। গ্রামের চারপাশের সব জমির মালিক শিখ। মুসলমানরা শিখদের জমির বর্গাদার। কয়েকটি মেথর পরিবার আছে মানো মাজরায়, যাদের ধর্ম পরিচয় অনিশ্চিত। মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের ধর্মের বলে দাবি করে। কিন্তু আমেরিকান মিশনারিরা যখন মানো মাজরায় এলো, তখন মেথররা খাকি সোলার টুপি পরে তাদের মেয়েদের নিয়ে হারমোনিয়াম সহযোগে প্রার্থনা সংগীতে অংশ নেয়। তারা কখনো কখনো শিখ মন্দিরেও যায়। একটি মাত্র বস্তুকে মানো মাজরার সকল বাসিন্দা, এমনকি লালা রাম লালও শ্রদ্ধা করে, সেটি হচ্ছে পুকুরের পাশে একটি কীকর গাছের নিচে খাড়াভাবে প্রোথিত তিন ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট বেলে পাথরের একটি চাঁই। এটি স্থানীয় একটি প্রতীক 'দেও'। যার কাছে হিন্দু, শিখ, মুসলিম অথবা নব্য খ্রিষ্টান সকলে তাদের বিশেষ প্রয়োজনের সময় আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য গোপনে গিয়ে প্রার্থনা করে। যদিও বলা হয়, মানো মাজরা শতদ্রু নদীর তীরে, কিন্তু গ্রাম থেকে নদী আধ মাইল দূরে। ভারতে নদীর খুব কাছাকাছি

গ্রামের অবস্থান সহনীয় নয়। মৌসুমের সঙ্গে বদলে যায় নদীর মতিগতি এবং কোনো সতর্কতা ছাড়াই তাদের গতি পরিবর্তিত হয়। শতদ্রু পাঞ্জাবের বৃহত্তম নদী। বর্ষণের পর শতদ্রুর পানি স্ফীত হয়ে দুই তীরের বিস্তীর্ণ বালুকাময় এলাকা প্লাবিত করে মাটির উঁচু বাঁধ উপচে পড়ার মতো হয়। তখন উত্তাল ঘোলা পানির বিস্তার ঘটে এক মাইলের বেশি। বন্যার তোড় কমে গেলে নদী হাজারটি গভীর ঝরনাধারায় পরিণত হয় এবং এসব ধারার মধ্যবর্তী স্থানে ভেসে থাকে ছোট ছোট অসংখ্য দ্বীপ। মানো মাজরার মাইলখানেক উত্তরে শতদ্রু নদীকে যুক্ত করেছে একটি রেলওয়ে সেতু। এটি চমৎকার দর্শনীয় সেতু— আঠারোটি বিশাল স্প্যানের প্রতিটি এক কলাম থেকে আরেক কলামকে যুক্ত করেছে ঢেউ এর মতো। সেতুর দুই প্রান্তে রেললাইন বসানোর জন্য পাথরের বাঁধের সৃষ্টি করা হয়েছে। বাঁধের পূর্ব প্রান্ত সম্প্রসারিত গ্রামের রেলস্টেশন পর্যন্ত।

মানো মাজরা পরিচিতি এর রেলস্টেশনের জন্য। যদিও সেতুতে রেললাইনের ট্র্যাক মাত্র একটি, কিন্তু স্টেশনে লাইন বেশ কটি, যে লাইনগুলোতে কম গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনগুলো অপেক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের পথ করে দিতে পারে।

স্টেশনকে ঘিরে দোকানি ও ফেরিওয়ালাদের পসরা সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যাত্রীদের কাছে খাবার, পান, সিগারেট, চা, বিস্কুট, মিষ্টি ইত্যাদি সরবরাহের জন্য। এর ফলে স্টেশনে সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা দেখা যায় এবং স্টেশনের কর্মচারীরা কিছুটা বাড়তি গুরুত্ব অনুভব করে থাকে। স্টেশন মাস্টার নিজেই তার অফিস ঘরের জানালায় কবুতরের খুপরির মুখের মতো গর্ত দিয়ে টিকিট বিক্রি করেন। ট্রেন এলে দরজার পাশে বহির্গমন পথে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে টিকিট সংগ্রহ করেন, টেবিলের ওপর বসানো টরেটক্কা মেশিন দিয়ে টেলিগ্রাফ বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করেন। ট্রেন এলে তিনি প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে যেসব ট্রেন এখানে থামবে না, সেগুলোকে সবুজ পতাকা প্রদর্শন করেন। তার একমাত্র সহকারী, প্ল্যাটফরমের ওপর কাচ দিয়ে ঘেরা কেবিনে লিভার উঠানো নামানোর কাজে ব্যস্ত থাকে। এর মাধ্যমে স্টেশনের দুদিকের সিগন্যালই নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া সে ট্র্যাক বদলে ইঞ্জিনের শান্টিং এ সহায়তা করে। সন্ধ্যায় সে প্ল্যাটফরমে স্থাপন করা অনেক বাতি জ্বেলে দেয়। অ্যালুমিনিয়ামের ভারী বাতি সিগন্যালে বসিয়ে দেয় লাল ও সবুজ কাচের পেছনে। সকালে বাতিগুলো নামিয়ে আনে এবং প্ল্যাটফরমের বাতি নিভিয়ে দেয়।

খুব বেশি ট্রেন মানো মাজরায় থামে না। এক্সপ্রেস ট্রেন তো কখনোই থামে না। অনেক মন্থর গতির যাত্রীবাহী লোকাল ট্রেনের মধ্যে মাত্র দুটি ট্রেন মানো মাজরায় থামে। একটি সকালে দিল্লি থেকে লাহোরগামী ট্রেন, আরেকটি সন্ধ্যায় লাহোর থেকে দিল্লিগামী ট্রেন। তাও মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। অন্য ট্রেনও থামে, যদি কোনো কারণে থামানো হয়। নিয়মিত থামার মধ্য আছে মালবাহী ট্রেন। যদিও মানো মাজরা থেকে কোনো মাল প্রেরণ অথবা মাল খালাস করার ব্যাপার কমই ঘটে, তবুও স্টেশনে লাইনগুলো দখল করে থাকে ওয়াগনের দীর্ঘ সারি। মানো মাজরা দিয়ে অতিক্রমকারী প্রতিটি মালবাহী ট্রেন কিছু ওয়াগন খুলে রেখে যায় এবং কিছু জুড়ে নিয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে পুরো গ্রাম যখন নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে, তখন মালগাড়ির হুইসেল ও ইঞ্জিনের দম নেওয়ার শব্দ, চাকার ঘর্ষণ, দুই ওয়াগনের সংযোগস্থলে লোহার আংটার শব্দ সারা রাতই শোনা যায়।

এসব কারণে মানো মাজরা ট্রেন সম্পর্কে বেশ সচেতন। দিনের আলো ফোটার আগে যখন লাহোরগামী মেল ট্রেনটি রেলসেতুর কাছে পৌঁছে, তখন ট্রেনের চালক অবশ্যই দীর্ঘক্ষণ ধরে দুবার হুইসেল বাজাবে। তাৎক্ষণিকভাবেই পুরো মানো মাজরা জেগে উঠে। কীকর গাছে বসা কাক ডাকতে শুরু করে। বাদুড় নীরবে আকাশে ডানা মেলে বটগাছের ডালে তাদের আশ্রয়ের জন্য বিবাদ শুরু করে। মসজিদের মুয়াজ্জিন জানেন যে ফজর নামাজের সময় হয়েছে। তিনি দ্রুত অজু করে পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়ান এবং কানে আঙুল দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ছন্দময় আওয়াজ তোলেন 'আল্লাহু আকবর'। মুয়াজ্জিনের আজান শেষ হওয়া পর্যন্ত শিখ গুরুদুয়ারার ভাই বিছানায় শুয়ে অপেক্ষা করেন। আজান শেষ হলে তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেন, গুরুদুয়ারার প্রাঙ্গণের কুয়া থেকে এক বালতি পানি তুলে স্নান করেন এবং পানির শব্দের মতো একটানা সুরে তার প্রার্থনা উচ্চারণ করতে থাকেন।

সকাল সাড়ে দশটায় দিল্লি থেকে যখন লোকাল ট্রেনটি এসে থামে, তখন মানো মাজরা নিত্যদিনের একঘেয়ে অলস কর্মসূচির মধ্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পুরুষরা মাঠে। মেয়েরা প্রাত্যহিক কাজে ব্যস্ত। শিশু-কিশোররা গরু মহিষ চরাতে নদীর তীরে। আটা পেষার কলে জোয়াল কাঁধে গরু যখন ঘোরে তখন চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ ওঠে। খড়কুটো ঠোঁটে চড়ুই পাখি ছাদে ওড়াউড়ি করে। দীর্ঘ মাটির দেওয়ালের ছায়ায় লাওয়ারিশ কুকুর শুয়ে থাকে।

বাদুড়গুলো তখন ডানা ভাঁজ করে নীরবে ঝুলে আছে ডালে ডালে এবং ঘুমিয়ে পড়েছে।

দুপুরবেলা মেল ট্রেনটি চলে গেলে মানো মাজরাও বিশ্রামের জন্য থামে। পুরুষ ও শিশু কিশোররা ঘরে ফিরে আসে দুপুরের খাবার খেতে ও বিশ্রামের জন্য। খেয়ে দেয়ে পুরুষেরা বটের ছায়ায় জড়ো হয়। বেঞ্চিতে বসে কথা বলে এবং ঝিমায়। ছেলেরা পুকুরে মহিষের পিঠে দাঁড়িয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ঘোলা পানি ছিটিয়ে খেলা করে। মেয়েরা গাছের নিচে খেলা করে। মহিলারা একে অন্যের চুলে তেল মেখে দেয়, তাদের ছেলেমেয়েদের মাথা থেকে উকুন বাছে এবং জন্ম, বিয়ে ও মৃত্যু নিয়ে আলাপ করে।

সন্ধ্যায় লাহোর থেকে লোকাল ট্রেনটি মানো মাজরায় পৌঁছলে সবাই আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গরু মহিষগুলো বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয় দুধ দোহনের পর গোয়ালে তোলার জন্য। মহিলারা রাতের খাবার রান্না করে। খাওয়ার পর পরিবারের সবাই ছাদে জড়ো হয়; গ্রীষ্মকালে প্রায় সবাই ছাদের ওপর ঘুমায়। রান্না শেষ হলে খাটিয়ায় বসে সবজি ও চাপাতি খায়, পিতলের বড় গ্লাসে সরওয়ালা গরম দুধে চুমুক দেয়। ঘুমের সংকেত না আসা পর্যন্ত তারা অলসভাবে জেগে থাকে। মালগাড়ি এলে একে অন্যকে বলে, 'মালগাড়ি যাচ্ছে'। এ উচ্চারণ ঘুমিয়ে পড়ার আগে 'শুভ রাত্রি' বলার মতো। মুয়াজ্জিন আবার উচ্চকণ্ঠে বিশ্বাসীদের আহ্বান করে 'আল্লাহু আকবর'। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ছাদের ওপরেই এশার নামাজ সেরে নেয়। শিখ ভাই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের অর্ধচন্দ্রাকৃতির সমাবেশে প্রার্থনা উচ্চারণ করে। কীকর গাছ থেকে কাকের ক্ষীণ ডাক শোনা যায়। ছোট বাদুড়গুলো আকাশে ডানা মেলে আর বড় বাদুর মন্থর কিন্তু মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিতে চারদিকে ঘোরে। স্টেশনে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে মালগাড়ি। ইঞ্জিন সামনে গিয়ে ও পিছিয়ে এসে এক লাইন থেকে আরেক লাইনে ওয়াগন বদলায়। যখন ট্রেনটি স্টেশন ত্যাগ করে তখন শিশুরা গভীর ঘুমে। বয়স্করা সেতুর ওপর দিয়ে ট্রেন অতিক্রম করার শব্দ শোনার অপেক্ষা করে, যেন এ শব্দ তাদের চোখে ঘুম এনে দেয়। মানো মাজরার জীবন অতঃপর নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। শুধু কুকুরগুলো জেগে থেকে ঘেউ ঘেউ করে রাতের অবশিষ্ট ট্রেনগুলো অতিক্রমের সময়। ১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মের পূর্ব পর্যন্ত মানো মাজরা সবসময় এমনই ছিল।

সে বছরে আগস্টের এক গভীর রাতে মানো মাজরার অদূরের কীকর বাগান থেকে বেরিয়ে এলো পাঁচজন লোক এবং নীরবে এগিয়ে গেল নদীর দিকে। ওরা ডাকাত অথবা পেশাদার দস্যু। একজন ছাড়া সবাই সশস্ত্র। সশস্ত্র

দুজনের হাতে বর্শা, বাকি দুজনের কাঁধে ঝুলছিল বন্দুক। পঞ্চম ব্যক্তি বহন করছিল একটি টর্চ। বাঁধের কাছে পৌঁছে লোকটি টর্চ জ্বালল। ঘোঁতঘোঁত করে কিছু বলে টর্চ নিভিয়ে দিলো।

সে বলল, 'আমরা এখানেই অপেক্ষা করব।'

বালির ওপরে বসে পড়ল সে। অন্যেরা তাকে ঘিরে বসল অস্ত্রগুলো হেলান দিয়ে রেখে। বর্শাধারীদের একজনকে লক্ষ্য করে টর্চধারী বলল 'জুগ্‌গার জন্য চুড়িগুলো এনেছিস তো?'

'অবশ্যই। এক ডজন লাল ও নীল চুড়ি। গ্রামের যে কোনো মেয়ে এগুলো পেলে খুশি হবে।'

বন্দুকধারীদের একজন বলল, 'কিন্তু জুগ্‌গা এতে খুশি হবে না।' সর্দার হেসে উঠল। সে হাতের টর্চ শূন্যে ছুড়ে দিয়ে ধরে ফেলল। আবার হাসল সে এবং টর্চটা মুখে পুড়ে সুইচ টিপল। মুখের মধ্যে আলো জ্বলে ওঠায় দুই গাল গোলাপি বর্ণ ধারণ করল। দ্বিতীয় বর্শাধারী বলল, 'জুগ্‌গা তার তাঁতির মেয়েকে চুড়িগুলো দিতে পারে। হরিণের মতো টানা চোখ ও আমের গুটির মতো ছোট স্তনের সঙ্গে এগুলো বেশ মানাবে। মেয়েটির নামটা যেন কী?'

সর্দার টর্চ নিভিয়ে মুখ থেকে বের করে বলল, 'নূরান'। বর্শাধারী বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নূরান। তোরা কি ওকে বসন্ত মেলায় দেখেছিস? আঁটোসাঁটো জামায় ওর স্তন যেন ফেটে বের হচ্ছিল। চুলের বেণিতে বাজছিল ঘুঙুর, রেশমি জামার উঠছিল হালকা শব্দ। হায়! হায়!'

যে বর্শাধারীর হাতে চুড়িগুলো সেও আফসোসের সাথে উচ্চারণ করল, 'হায়! হায়'! এতক্ষণ মুখ খোলেনি যে বন্দুকধারী এবার সে বলল, 'জুগ্‌গাকে সে নিশ্চয়ই উজাড় করে দেবে। দিনের বেলায় তাকে এমন নিরীহ মনে হয় যেন তার দুধের দাঁতও পড়েনি। কিন্তু রাতের বেলায় সে চোখে কালো সুরমা লাগায়।'

একজন মন্তব্য করল, 'সুরমা চোখের জন্য ভালো। চোখ ঠান্ডা রাখে।'

বন্দুকধারী বলল, 'অন্যের চোখেও দেখতে ভালো লাগে।'

'তাদের কামনাকেও ঠান্ডা করে।'

সর্দার উচ্চারণ করল, 'জুগ্‌গা'!

অন্যেরা হেসে উঠল। তাদের একজন হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো।

সে বলল, 'শোন! মালগাড়ি যাচ্ছে।'

সবাই হাসি থামাল। নীরবে তারা এগিয়ে আসা ট্রেনের শব্দ শুনল। জোরে শব্দ করে মালগাড়ি থেমে গেল। ওয়াগনের সংযোগস্থলে ঘর্ষণের শব্দও শোনা গেল। কিছুক্ষণ পর ইঞ্জিনের এগিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে আসা ও ওয়াগন পাশের লাইনে রেখে আসার সময় আরেক ওয়াগনে ধাক্কা লাগার প্রচণ্ড শব্দ উঠল। এক সময় ট্রেনে এসে লাগল ইঞ্জিন।

সর্দার বলল, 'এখনই রাম লালের সাথে বোঝাপড়ার সময়।' উঠে দাঁড়াল সে।

তার সঙ্গীরাও উঠে পড়ল এবং কাপড় থেকে বালি ঝেড়ে এক সারিতে দাঁড়িয়ে প্রার্থনার জন্য হাত জোড় করল। বন্দুকধারীদের একজন সামনে গিয়ে প্রার্থনা উচ্চারণ শুরু করল। যখন সে থামল তখন সকলে হাঁটু গেড়ে মাটিতে কপাল স্পর্শ করল। এরপর দাঁড়িয়ে তাদের পাগড়ির ঝুলে থাকা অংশটুকু দিয়ে মুখ পেঁচিয়ে নিল। শুধু তাদের চোখ খোলা রইল। মালগাড়ির ইঞ্জিন দুবার দীর্ঘ হুইসেল বাজিয়ে রেল সেতুর দিকে এগিয়ে গেল।

'এখনই চলো।' সর্দার বলল।

অন্যেরা তাকে অনুসরণ করল বাঁধের ওপর দিয়ে এবং মাঠের মধ্য দিয়ে। মালগাড়ি যখন সেতুতে পৌঁছেছে তখন তারা পুকুরের পাশ দিয়ে একটি সরু রাস্তা ধরল, যে রাস্তাটি গেছে গ্রামের একেবারে মাঝখানে। তারা লালা রাম লালের বাড়ির সামনে এলো। দলনেতা বন্দুকধারী একজনকে ইঙ্গিত করল। সে এগিয়ে গিয়ে বন্দুকের বাঁট দিয়ে দরজায় আঘাত করতে লাগল।

সে চিৎকার করে ডাকল, 'ওই বেটা রাম লাল!'

কোনো উত্তর নেই। আগন্তুকদের আশপাশে কয়েকটি কুকুর জড়ো হয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে। একজন তার বর্শার চ্যাপটা অংশ দিয়ে একটি কুকুরকে আঘাত করল। আরেকজন তার বন্দুকের ফাঁকা গুলি ছুড়ল। কুকুরগুলো কুঁই কুঁই শব্দ তুলে দৌড়ে পালাল এবং নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে আরো জোরে ঘেউ ঘেউ শুরু করল।

লোকগুলো তাদের অস্ত্র দিয়ে দরজায় আঘাত করা অব্যাহত রাখল। একজন তার বর্শা দিয়ে দরজায় আঘাত করতেই বর্শা দরজা ভেদ করল। সে চিৎকার করল, 'দরজা খোল হারামজাদা। নইলে সবাইকে খুন করে ফেলব।' একটি মহিলা কণ্ঠ উত্তর দিলো, 'এত রাতে তোমরা কারা ডাকাডাকি করছ। লালাজি শহরে গেছেন।'

'দরজা খোল, তারপর তোমাকে বলছি, আমরা কে। তা না হলে আমরা দরজা ভেঙে ফেলব' সর্দার বলল।

'আমি তোমাদের বলছি, লালাজি বাড়িতে নেই। তিনি চাবি সঙ্গে নিয়ে গেছেন। বাড়িতে কিছুই নেই।'

লোকগুলো দরজায় কাঁধ লাগিয়ে ঠেলা দিলো, পিছিয়ে এসে ক্ষিপ্ত ভেড়ার মতো আবার ধাক্কা দিতেই ভেতর থেকে লাগানো কাঠের খিল ভেঙে দরজা খুলে গেল। একজন বন্দুকধারী দরজায় দাঁড়াল, বাকি চারজন ঘরের মধ্যে ঢুকল। এক কোনায় দুজন মহিলা গুটিশুটি মেরে বসে ছিল। বড় বড় কালো চোখবিশিষ্ট সাত বছর বয়সি একটি ছেলে অপেক্ষাকৃত বয়স্কা মহিলাকে আঁকড়ে ধরে ছিল।

বয়স্কা মহিলা অনুনয় করে বলল, 'ভগবানের দোহাই, আমাদের যা আছে সব নিয়ে যাও, সব অলংকার, সবকিছু।' হাত বাড়িয়ে দিলো সোনা ও রুপার ব্রেসলেট, নূপুর, কানের দুল।

লোকগুলো একজন মহিলার হাত থেকে ছোঁ মেরে অলংকারগুলো নিল।

'লালা কোথায়?'

'গুরুর নামে শপথ করে বলছি, তিনি বাইরে গেছেন। আমাদের সবকিছুইতো তোমরা নিয়েছ। লালাজির কাছে দেওয়ার মতো আর কিছু নেই।'

ভেতরের আঙিনায় এক সারিতে চারটি বিছানা পাতা। বন্দুকধারী ছোট ছেলেটিকে তার দাদিমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার মুখের কাছে বন্দুকের নল তাক করল। মহিলা দুজন তার পায়ে পড়ে মিনতি করতে শুরু করল।

'তোমরা আমার ভাই, ওকে মেরো না, গুরুর দোহাই।'

বন্দুকধারী লাথি মেরে মহিলাদের দূরে সরিয়ে দিলো।

'তোর বাপ কোথায়?'

ছেলেটি ভয়ে কাঁপছিল। তোতলাতে তোতলাতে সে বলল, 'ওপরের তলায়।' বন্দুকধারী ছেলেটিকে মহিলার কোলে ঠেলে দিলো। লোকগুলো ঘর ছেড়ে আঙিনায় এসে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠল। ছাদের ওপর একটি মাত্র রুম। অপেক্ষা না করে তারা এক সাথে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ল। রুমে স্টিলের ট্রাংক, একটির ওপর আরেকটি। দুটি খাটিয়ার ওপর বেশ কটি লেপ গোল করে রাখা। টর্চের আলো ফেলা হলো রুমের সবখানে। একটি খাটিয়ার নিচে মহাজন গুটি মেরে লুকিয়ে আছে।

মহিলার কণ্ঠ নকল করে লোকগুলোর একজন বলল, 'গুরুর নামে শপথ করে বলছি, লালাজি বাইরে গেছেন।' লোকটি রাম লালের পা ধরে খাটিয়ার নিচ থেকে টেনে বের করল।

সর্দার তার হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মহাজনকে চড় কষাল, 'মেহমানদের সঙ্গে এটাই তোর আচরণের ধরন? আমরা এসেছি, আর তুই খাটিয়ার নিচে লুকিয়ে পড়লি।'

রাম লাল দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল।

সর্দার রাম লালের পাছায় লাথি মেরে জিজ্ঞেস করল, 'সিন্দুকের চাবি কোথায়?'

মহাজন অনুনয় করল, 'তোমরা সব নিয়ে যাও— গয়না, নগদ টাকা, হিসাবের খাতা, সব। কাউকে খুন করো না।' দুহাতে সর্দারের পা জড়িয়ে ধরেছে রাম লাল।

সর্দার আবার বলল, 'সিন্দুকের চাবি কোথায়।' মহাজনকে লাথি মেরে মেঝের ওপর ফেলে দিলো। রাম লাল বসে ভয়ে কাঁপছিল।

পকেট থেকে টাকার বান্ডিল বের করে পাঁচজনকে দিতে দিতে বলল, 'এগুলো নাও। এছাড়া বাড়িতে আর কিছু নেই। সব তোমাদের।'

'তোমার সিন্দুকের চাবি কোথায়?'

আমার হিসাবের খাতা ছাড়া সিন্দুকে আর কিছুই নেই। আমার যা ছিল তোমাদের দিয়েছি। আমার যা আছে সবই তোমাদের। গুরুর নামে বলছি, 'আমাকে ছেড়ে দাও।' রাম লাল সর্দারের পা হাঁটুর ওপর আঁকড়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল, 'গুরুর নামে বলছি, গুরুর নামে বলছি!' একজন মহাজনকে সর্দারের পা থেকে ছাড়িয়ে তার মুখের ওপর বন্দুকের বাঁট দিয়ে জোরে আঘাত করল।

রাম লাল জোরে আর্তনাদ করে উঠল, 'হায় ভগবান!' তার মুখ থেকে রক্ত বের হতে লাগল।

উঠোন থেকে দুই মহিলা মহাজনের আর্তনাদ শুনতে পেয়ে চিৎকার শুরু করল, 'ডাকাত! ডাকাত!'

কুকুরগুলো ডেকেই চলেছে। কিন্তু একজন গ্রামবাসীও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো না।

বাড়ির ছাদে মহাজনকে পিটানো হচ্ছিল বন্দুকের বাঁট, বর্শার দণ্ড দিয়ে। এছাড়াও চলছিল লাথি ও ঘুসি। সে মেঝেতে বসে কাঁদছিল আর রক্তমাখা

থুতু ফেলছিল। তার দুটি দাঁত ভেঙে গেছে। তবু কিছুতেই সিন্দুকের চাবি হাতছাড়া করবে না। বেপরোয়া হয়ে একজন মহাজনকে বর্শা দিয়ে পেটে আঘাত করল। রাম লাল উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে পড়ে গেল। তার পেট থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। লোকগুলো বের হয়ে এলো। তাদের একজন দুটি ফাঁকা গুলি ছুড়ল। মহিলাদের বিলাপ বন্ধ হলো। কুকুরগুলো চুপ করল। গ্রামও নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

ডাকাতরা ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচের রাস্তায় নামল। নদীর দিকে যেতে যেতে তারা পৃথিবীকে তাদের কাছে তুচ্ছ করার ধ্বনি তুলছিল।

'আয় কার কত বড় বুকের পাটা বেরিয়ে আয়। তাদের মা বোনের ধর্ষণ দেখতে চাইলে সামনে আয়। দেখি কত তোদের সাহস!'

কেউ তাদের কথায় জবাব দিলো না। মানো মাজরায় একটি শব্দও উঠল না। লোকগুলো সরু রাস্তাটি ধরে চিৎকার করে হাসতে হাসতে যাচ্ছিল। গ্রামের এক প্রান্তে একটি ছোট্ট কুঁড়েঘরের কাছে থামল তারা। সর্দার বর্শাধারী একজনের দিকে ফিরল।

সে বলল, 'এই হচ্ছে বিখ্যাত জুগ্‌গার বাড়ি। আমাদের উপহারের কথা ভুলে গেলি। ওর চুড়িগুলো দে।'

বর্শাধারী তার কাপড়ের মধ্য থেকে একটি প্যাকেট বের করে দেওয়ালের ওপর দিয়ে ছুড়ে দিলো। উঠোনে কাচ ভাঙার শব্দ উঠল

কণ্ঠে ভিন্ন সুর এনে সে বলল, 'আরে ও জুগ্‌গিয়া।' সঙ্গীদের দিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকাল। 'চুড়িগুলো পরে নে আর হাতে মেহেদি মাখ।'

বন্দুকধারী যোগ করল, 'তাঁতির বেটিকেও চুড়িগুলো দিতে পারিস।' অন্যেরা মুখে চুক চুক শব্দ তুলল, 'হায়, হায়!' ঠোঁট দিয়ে দীর্ঘ চুম্বনের ভঙ্গি করছিল লাম্পট্যে।

সরু পথ ছেড়ে নদীর দিকের পথ ধরেছে তারা। তখনো তারা হাসছে, মুখে চুম্বনের শব্দ তুলছে। জুগ্‌গত সিং তাদের কোনো কিছুর উত্তর দেয়নি। সে তাদের কোনো কথা শোনেনি। কারণ সে বাড়ি ছিল না।

জুগ্‌গত সিং ঘণ্টা খানেক আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। রাতের মালগাড়ির শব্দ যখন তাকে ইঙ্গিত দিয়েছে যে, এখন বের হওয়া নিরাপদ তখনই সে বাড়ি ছেড়েছে। তার জন্য এবং ডাকাতদের জন্যও সে রাতের ট্রেনের আগমন ছিল একটি সংকেত। প্রথম দূরাগত শব্দের পরই সে খাটিয়া থেকে নামল, পাগড়িটা উঠিয়ে মাথায় পরে সন্তর্পণে পা ফেলে আঙিনা অতিক্রম করে খড়ের

গাদা থেকে একটি বর্শা বের করল। আবার ধীরে পা ফেলে খাটিয়ার কাছ থেকে জুতা হাতে তুলে নিল। এরপর দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

জুগ্‌গত সিং থামল। তার মা এর গলা।

সে বলল, 'মাঠে যাচ্ছি। কাল রাতে জংলি শুয়োর খেতের অনেক ক্ষতি করেছে।'

'শুয়োর! আমার সাথে চালাকি করিস না। তুই কি ভুলে গেছিস যে এখনো তুই জামিনে আছিস। সন্ধ্যার পর গ্রামের বাইরে যাওয়া তোর জন্য নিষিদ্ধ। আর তোর হাতে বর্শা! শত্রুরা তোকে দেখে ফেলবে। তোর নামে নালিশ করবে। আবার তোকে জেলে পাঠাবে।' তার কণ্ঠ কান্নার মতো শোনাল। 'তখন কে দেখবে খেতের ফসল, আর গরু মহিষ?'

'আমি শিগ্‌গির ফিরে আসব।' জুগ্‌গত সিং বলল। 'ভয়ের কিছু নেই। গ্রামের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'না, তুই কোথাও যাবি না।' তার কণ্ঠে আবার কান্নার সুর।

'চুপ করো।' জুগ্‌গত ধমকে উঠল। 'তোমার চিৎকারেই পড়শিরা জেগে উঠবে। চুপচাপ থাকো, কোন সমস্যা হবে না।'

'যা, যেখানে খুশি যা। তুই কুয়ায় ঝাঁপ দিতে চাইলে ঝাঁপ দে। তোর বাপের মতো ফাঁসিতে ঝুলতে চাইলে তাই কর। আমার কপালে লেখা আছে, আমাকে কাঁদতে হবে। কিসমতই খারাপ আমার'—কপাল চাপড়ে বলল জুগ্‌গতের মা।

জুগ্‌গত সিং দরজা খুলে দুপাশে দেখল। আশপাশে কেউ নেই। দেওয়ালের পাশ ঘেঁষে গিয়ে সে পুকুরের দিকের রাস্তাটায় উঠল। পাশের খেতে এক জোড়া বকের ধূসর ছায়া দেখল, ব্যাং ধরার আশায় ধীরে ধীরে কাঁদার মধ্যে পা ফেলছে। বক দুটো হঠাৎ তাদের ব্যাং অনুসন্ধান থামিয়ে মাথা তুলল। যতক্ষণ বক নিশ্চিত বোধ না করল, জুগ্‌গত দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। এরপর আলপথ ধরে মাঠের মধ্য দিয়ে নদীর দিকে চলল। নদীর পানির নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বে তাকে বালুকাময় তীর পাড়ি দিতে হলো। হাতের বর্শা মাটিতে গেঁথে সে বালির ওপর শুয়ে পড়ল। চিত হয়ে সে আকাশের তারা দেখছিল।

সহসা একটি হাত তার চোখ চেপে ধরল।

'বলো তো, কে?'

জুগ্‌গত সিং তার দু-হাত মাথার ওপরে তুলে পেছনের দিকে হাতড়াতে শুরু করল। মেয়েটি হাত সরিয়ে দিলো। জুগ্‌গত এবার তার চোখ চেপে ধরা হাত অনুসরণ করে মেয়েটির কাঁধ, এরপর মুখ স্পর্শ করল। সে তার গাল, চোখ, নাকে আদর করল। তার হাত এসবের সাথে ভালোভাবে পরিচিত। সে তার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে খেলার চেষ্টা করল যাতে সে আঙুলে চুমু দেয়। মেয়েটি মুখ খুলল এবং জোরে আঙুল কামড়ে দিলো। জুগ্‌গত ঝাঁকুনি দিয়ে হাত সরিয়ে নিল। এরপর সে দ্রুত দু-হাত দিয়ে মেয়েটির মাথা ধরে তার মুখ নিজের মুখের ওপর টেনে আনল। এরপর দু-হাতে তার কোমর পেঁচিয়ে আলতো করে ওপরে তুলে ধরল। মেয়েটি আটকা পড়া কাঁকড়ার মতো হাত পা ছুড়ছিল। হাতে ব্যথা না হওয়া পর্যন্ত সে তাকে ওপরেই ধরে ছিল। এরপর তাকে নিজের ওপরে স্থাপন করল। জুগ্‌গতের প্রতিটি অঙ্গের ওপর মেয়েটির অঙ্গ। সে জুগ্‌গতের মুখের ওপর দু-হাতে আঘাত করতে লাগল। 'একজন অচেনা মেয়ের গায়ে তোমার হাত লাগিয়েছ। বাড়িতে কি তোমার মা-বোন নেই। তোমার কি কোনো লজ্জা শরম নেই। পুলিশের খাতায় যে খারাপ লোক হিসেবে তোমার নাম লেখা আছে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইন্সপেক্টর সাহেবের কাছে আমিও অভিযোগ করব যে তুমি একটা আস্ত বদমাশ।'

'আমি শুধু তোমার কাছেই বদমাশ, নূরু। আমাদের দুজনকে একই হাজত খানায় রাখা উচিত।'

'তুমি বেশি বেশি কথা বলতে শিখেছ। আমাকে আরেকজন মানুষ খুঁজতে হবে।'

জুগ্‌গত সিং দুহাতে মেয়েটির পিঠ জাপটে ধরল, যতক্ষণ তার কথা বা দম নেওয়া বন্ধ না হলো। যখনই সে মুখ খুলতে চেষ্টা করেছে তখনই সে জোরে চেপে ধরেছে এবং তার কথা গলায় আটকে গেছে। অবশেষে সে হাল ছেড়ে দিলো। তার ক্লান্ত মুখ জুগ্‌গতের মুখের ওপর স্থাপন করল। জুগ্‌গত তাকে তার পাশে শুইয়ে দিলো মাথাটা বাম কাঁধে রেখে। ডান হাতে সে তার চুল ও মুখ আঁকড়ে ধরল।

মালগাড়ি দু-বার হুইসেল বাজাল এবং জোরে শব্দ তুলে সেতুর দিকে এগিয়ে গেল। বকগুলো ভয়ার্ত শব্দ করে ডানা মেলে এলো নদীর পানে। নদী